দৈনিক বাংলা · 014
তারিখ ... 27/1/83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

# প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বেলা খাবার ব্যবস্থা করা যায়?

সাপ্তাহিক ছুটি নয়, আমাদের পোশাকেরও প্রয়োজন নেই। এক বেলা ভাতের যোগাড় করে দিতে পারবেন? এক বেলা ভাত। পাঠ্য বই। তাও নয়। শুধু এক বেলা ভাত।

খানিকক্ষণ থমকে গেলাম। এমন কথা শুনবো আশা করিনি। পৌষ মাসের শেষ। রোদে শীতের আমেজ। নৌকা চলছিল নিস্তরঙ্গ খালে। মহকুমা মাদারীপুর। জেলা ফরিদপুর।

পথে থেকে উঠেছিলেন তিনি। যাবেন কিছু দূরে। নৌকা পাননি। সাথে দুই শিশুপুত্র। যাবেন কি করে? তাই নৌকা দেখে ডেকেছিলেন। সে নৌকায় যাত্রী আমি একা। সহযাত্রী এলে মন্দ কি! দুই শিশুপুত্র নিয়ে উঠেছিলেন তিনি। তারপর কথা বলার পালা।

কথায় কথা বাড়ে। ধানের কথা। চালের কথা। মাছের কথা। এবার ধান হয়েছে এ এলাকায়। মানুষ দু মুঠো ভাত খাচ্ছে কিছুদিন ধরে। আর দু বেলা দু মুঠো ভাত খেতে গিয়েই বিপত্তি। গত বছর ফসল ফলেনি। অধিকাংশ মানুষের ঘরেই খাবার ছিল না। দু বেলা ভাতের মুখ দেখেনি অনেকেই। তাই দু বেলা ভাত খেতে গিয়েই বিপদ। পেটে সয়নি। উদরাময় দেখা দিয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকায়। না খাওয়ায় শরীর ভেঙে গেছে। রোগ প্রতিরোধের শক্তি কমেছে। তাই এবার কলেরা ফরিদপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায়।

এই কলেরাকে আমরা নানান নামে লিখেছি। সাধারণ মানুষ আমাদের লেখার ধার ধারে না। আমাদের পত্রপত্রিকার খবর রাখে না। কেউ বলে কলেরা কেউ বলে ওলা। আমাদের কাছে খবর পৌঁছাবার আগে তারা অক্কা পায়। উপরের কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করলে ভিন্ন কথা বলা হয়। বলা হয়, সর্বত্র নাকি ভ্যাকসিন পৌঁছেছে। বলা হয়, চিকিৎসার নাকি কোন ত্রুটি হচ্ছে না। মাদারীপুর বা গোপালগঞ্জ মহকুমার সদরে গেলে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সকল হিসাব-নিকাশ পাওয়া যায়।

কিন্তু এই হিসাবের সাথে গ্রামের মানুষের হিসাব মেলে না। আমি গ্রামে গ্রামে দেখেছি ওষুধের অভাব। ভ্যাকসিনের অভাব। বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব। দেখেছি স্যালাইন নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের মুনাফাখোরী। আর অসহায় মানুষকে দেখেছি পীরের দরগায় শিন্নি দিতে। মন্দিরে মানত করতে।

আমি জানি, আমার কথার অনেকেই প্রতিবাদ করবেন। ভিন্ন হিসাব দেবেন। তবে আমার আবেদন থাকবে প্রতিবাদ করার আগে যেন একটু আমার সাথে আলাপ করেন। আমি আপনাদেরকে আমার সাথে নিয়ে যেতে রাজী আছি কলেরার এলাকায়। আপনাদের ব্যর্থতা পর্বতপ্রমাণ।

এ কাহিনী আমাকে নৌকার সহযাত্রী বলেনি। আমাকে কেউ ডেকে নিয়ে কেউ শোনায়নি কোন ঘটনা। আমি নিজে গিয়েছি গ্রাম-গ্রামান্তরে। এ আমার নিজের অভিজ্ঞতা।

তাই আমার আবেদন, এবারের কলেরাকে একটু ভিন্ন প্রেক্ষিতে দেখুন। এবারের কলেরা সাংবাৎসরিক ঘটনা নয়। এবারের কলেরা হয়েছিল অভাবী এলাকায়। যে এলাকার মানুষ গত এক বছরে কোন ফসল পায়নি। অভাব-অনটনে যা পেয়েছে তা-ই খেয়েছে। তারপর পুরো পেট খেতে পেয়ে কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। এ হচ্ছে আমাদের দুর্ভাগ্যের কাহিনী। পুরো পেট খাওয়ার সামর্থ্য নয়, শক্তিও আমরা হারাচ্ছি দিনের পর দিন। আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ঘটনা অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন।

**ধান মহাজনের**

কিন্তু এই পেট পুরে খাওয়াই বা কত দিন? এক মাস বা দু মাস? এ কথাই বলছিলেন আমার নৌকার সহযাত্রী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সাথের দুই শিশুপুত্র তাঁরই স্কুলে পড়ে। তিনিই তুলেছিলেন ভাতের কথা।

ভাতের কথা বলতে গিয়ে ভিন্ন কথা এলো। সত্যি এবার ধান হয়েছে গোপালগঞ্জ-মাদারীপুরের একটি বিরাট এলাকায়। কিন্তু সে ধান তো কৃষকের গোলায় যায়নি। গত বার অভাবে পড়ে মানুষ ঋণ করেছে। সে ঋণের কথা শুনলে আঁৎকে উঠতে হয়। বহু এলাকায় এক শ টাকা ঋণের জন্যে তিন মন ধান দিতে হয়েছে। অর্থাৎ ঋণের দায়ে সব ধানই গেছে মহাজনের গোলায়। অনেক আশা নিয়ে কৃষক ধান ফলিয়েছে। ধানের সোনালী গোটা দেখে উদ্বেলিত হয়েছে। সে ধান তার ঘরে ওঠেনি। চলে গেছে মহাজনের গোলায়। মহাজনের ঋণ এখন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে গ্রামকে। গ্রামে গিয়ে যদি চিৎকার করে জিজ্ঞেস করা যায়—ধান কার? তাহলে হয়তো ঐ মাঠ থেকে সবুজ ধানের চারাই জবাব দেবে—এ ধান মহাজনের। ঋণের দায়ে সব কিছুই বাধা।

**কৃষি ব্যাংক**

কিন্তু একথা তো ছিল না। ঋণ দেয়ার কথা ছিল কৃষি ব্যাংকের। কৃষি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমাকে মাফ করবেন। আমি অভিযোগের সুরে বলতে চাই যে আপনাদের কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন করছে না। গরীবের পক্ষে ঋণ পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। টাকা না দিলে আপনাদের কর্মচারীরা ঋণ দেয় না। ঋণ আনতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হতে হয়। একথা আমরা বার বার লিখেছি। আপনারা কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে আজকে আর মনে হয় না। আমরা সুস্পষ্টভাবে নাম ধরে ঘটনা উল্লেখ করে লিখেছি, আজকেও লিখতে পারি। কিন্তু আপনাদের ঘুম ভাঙবে বলে মনে হয় না। আমার কাছে আপনাদের ঋণ টেলিভিশন, বেতার আর সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের পণ্য। আর গ্রামের টাউট, ফড়িয়া এবং আপনাদের কর্মচারীদের হাতে নিঃস্ব মানুষকে হয়রানি করার হাতিয়ার।

এই কথাগুলি আমার চাইতেও কড়া করে বলছিলেন সেই সহযাত্রী। তাঁর কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিলো এ তো সেই মানুষের কথা যার আঁতে ঘা লাগে। মহাজন দেখলে যে ভয় পায়। যে কৃষি ঋণ আনতে গিয়ে বিপর্যস্ত হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কৃষি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে আমি শুধু একটি কথাই জিজ্ঞেস করতে চাই।

কৃষি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বলতে পারেন আপনাদের এতো শাখা থাকতেও গ্রামের মানুষ মহাজনের কাছে কেন যায়? কেন কয়েক শ গুণ বেশি সুদ দিয়ে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেয়? কেন আপনাদের কাছাকাছি যায় না? কেন সামাজিক প্রতিপত্তি না থাকলে আপনাদের ঋণ পায় না? কেন শয়ে শয়ে কৃষি ব্যাংক থাকা সত্ত্বেও গ্রাম-বাংলায় মহাজনদের এতো প্রতাপ? এ প্রশ্নের জবাব দেবার দায়িত্ব নিশ্চয়ই আপনাদের?

আমি জানি এর জবাব আপনারা দিতে পারেন। সুন্দর করে হিসাব দিতে পারেন ঋণ দেবার তালিকার। কিন্তু সে তালিকায় সত্য ছবিটি ফুটে উঠবে না তা আপনারাও জানেন। তাই আমার আবেদন, দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের শায়েস্তা করুন। মুষ্টিমেয় কিছু-সংখ্যক দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের জন্য সকল কর্মচারীদেরকে ভুগতে হচ্ছে। গ্রাম-গ্রামান্তরে কৃষি ব্যাংকের কর্মচারীদের কেউ বিশ্বাস করে না। এই অপ্রিয় সত্যের প্রতিবাদ করতে পারবেন কি? পারলে খুশি হবো।

**এক বেলা ভাত**

এর পরের কথা ভিন্ন ধরনের। এর পর উঠেছিল স্কুলের কথা। আমার সহযাত্রী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। তাই কৌতূহল তাঁর বেশি ছিল। এবং কথা বলতে বলতে একটি অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসলেন। তাঁর প্রস্তাব প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে সকলকে বিনা মূল্যে বই দেয়া হবে। তৃতীয় শ্রেণীর শতকরা পঞ্চাশ জন ছাত্রকে বিনা মূল্যে বই দেয়া হবে। কোন পঞ্চাশ ভাগ ছাত্র বিনা মূল্যে বই পাবে তা নির্ধারণ করবেন শিক্ষকরা।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে সব ছাত্রদের পোশাক দেয়া হবে। এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেয়ার জন্য। প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররা যদি বুঝতে পারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠলে পোশাক পাওয়া যাবে তাহলে তারা ভাল করে লেখাপড়া করবে। এমনি করে প্রেরণা পাবে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্ররা। চতুর্থ শ্রেণীতে উঠলে তারাও পোশাক পাবে। সুতরাং তাদের ভাল করে লেখাপড়া করার কথা। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে নতুন শিক্ষা বছর থেকে।

কিন্তু ভাতের কি হবে? এ প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন আমার সহযাত্রী শিক্ষক। তিনি বলেছিলেন, গতবার ধান হয়নি। অধিকাংশ ছাত্র স্কুলে আসেনি। এবার ধান হয়েছে। চৈত্র মাসের মধ্যে এ ধান ফুরিয়ে যাবে। এবং চৈত্র মাস পর্যন্তই কিছু কিছু ছেলে স্কুলে আসবে। তার পরেও ঐ বাচ্চারাই পেটের দায়ে কাজ করতে যাবে। কেউ যাবে মাছ ধরতে, কেউ যাবে নৌকায়, আবার কেউ যাবে শহরে। এদের জন্য যদি এক বেলা ভাতের ব্যবস্থা করা যেতো। যদি দুপুরে কিছু খাবার দেয়া যেতো তাহলে দেখতেন কত ভিড় স্কুলগুলিতে। ছাত্র খুঁজে আনতে হতো না। ওরাই আসতো স্কুলে। নাম লেখাতো। খাবার জন্যে স্কুলের নিয়ম মানতে মানতে একদিন পড়াশুনা শুরু করতো। নইলে ওদের স্কুলে আনা কঠিন কাজ। কারণ, পেটে খেলে তো পিঠে সইবে।

এর পরে আমার জবাব দেবার কিছুই ছিল না। আমি জানি এ ব্যাপারটি একান্তই কঠিন। আমি জানি, আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠবার সময় শতকরা ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী স্কুল ছেড়ে চলে যায়। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শতকরা ৮০ জন স্কুল ছাড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বাকী থাকে শতকরা পাঁচ থেকে দশজন। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পায়। এ তথ্য সকলেরই জানা। জানা বলেই আমার নতুন করে কিছু লেখার নেই। শুধু ঐ গ্রামের স্কুলের শিক্ষকের মত আমিও বলবো প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার ব্যাপারটি একটু ভিন্নভাবে ভাবতে হবে। শুধু শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলে হবে না। শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এর অন্য বিকল্প নেই।

—অনিকেত